অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ১১ ▪ নভেম্বর ২০১৯

আলাপ

লাইলী বেগমের সংগ্রামী জীবন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮। সংখ্যা ১১
নভেম্বর ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথী

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

যশোর সদর উপজেলার হাসিমপুর গ্রাম। এই গ্রামেরই এক দরিদ্র পরিবারে লাইলী বেগমের জন্ম। অভাবের কারণেই তার বাবা অল্প বয়সে তাকে বিয়ে দেন। বিয়ের পর সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে উঠতে না উঠতেই তার কপালে নেমে আসে দুর্যোগ। বিয়ের ১২ বৎসরের মাথায় তার স্বামী মারা যায়। ঠাঁই হয়না বাবার বাড়িতেও। এরপর শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। অভাব সইতে না পেরে এক সময় ভিক্ষা করার কথা ভাবেন লাইলী বেগম। কিন্তু ভিক্ষা তো দূরে থাক, এখন লাইলী বেগমকে আর অন্যের বাসায় কাজ করতেও হয় না। কিন্তু কীভাবে হলো তার জীবনের এই পরিবর্তন? জানতে চোখ রাখুন আলাপের পাতায়। লাইলী বেগমের সেই জীবন যুদ্ধের কথা নিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের আলাপের মূল রচনা।

'আমরা নারীরা' বিভাগে জানব বিলকিস বেগমের স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প। এছাড়া এই সংখ্যা আলাপের জেনে নেই বিভাগে রয়েছে সৌহার্দ্য প্রকল্প-৩ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি লিখা। লিখাটি পড়ে আমরা জানব, এ প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন এলাকার মানুষ। এছাড়াও আলাপের অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে লিখা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ■

সূচিপত্র

- লাইলী বেগমের সংগ্রামী জীবন ১ - ২
- মিশনের প্রেসিডেন্টের যশোরী ও খুলনা এলাকা পরিদর্শন ৩
- নরসিংদীর মনোহরদীতে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত ৪
- নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এনেছে শীতল পাটি ৫ - ৬
- আমি এখন স্বাবলম্বী ৭ - ৮
- আমাদের সংলাপ ৯
- যশোরের ভাসমান সেতু ১০-১১
- চা ছাড়া কাজ শুরু করে না যে ঘোড়া ১২
- মাংসের ভাপা পিঠা তৈরি ১৩

লাইলী বেগমের সংগ্রামী জীবন

মূল রচনা

লাইলী বেগমের দোকান

গ্রামের নাম হাসিমপুর। যশোর সদর উপজেলায় গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামেরই এক দরিদ্র পরিবারে লাইলী বেগমের জন্ম। দরিদ্র পরিবারে জন্ম বলেই লেখাপড়া তেমন হয়নি। মাত্র তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করতে পেরেছিলেন তিনি। তাও অভাবের সংসারে অনেক কষ্ট করেই এতটুকু। আর তাদের এ অভাবের কারণেই অল্প বয়সে তার বাবা তাকে বিয়ে দেয়। তার বিয়ে হয় একই গ্রামের লোকমান মুন্সির সাথে। বিয়ের দুই বছরের মাথায় তাদের কোল জুড়ে আসে একটি ছেলে সন্তান। কিন্তু কপাল মন্দ তার। সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে উঠতে না উঠতেই তার কপালে নেমে আসে দুর্যোগ। বিয়ের ১২ বৎসর পার না হতেই তার স্বামী মারা যায়। ফলে স্বামীর বাড়ি থেকেও ভাত উঠে যায় তার। ওদিকে তার বাবাতো অভাবের হাত থেকে বাঁচতেই তাকে বিয়ে দিয়েছিল। তাই বাবার বাড়িতেও লাইলী বেগমের জায়গা হয় না।

পাশের গ্রাম বেলতলায় ছিল তার মামার বাড়ি। উপায় না দেখে সেখানেই চলে যান লাইলী বেগম। মামারাও ছিলেন খুবই দরিদ্র। তাই বাড়িতে ঠাই দিলেও তাকে খাওয়া পরা দিতে পারতেন না। ছেলেকে নিয়ে অন্যের বাড়ি কাজ করে কোনো মতে দিন কাটতে লাগল তাদের। কিন্তু এভাবে কতদিন? দিন তো আর চলেনা। ছেলেকে লেখাপড়া করানোর খুবই ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব হবে? তাদের এলাকায় নারীদের মাঠে কাজ করারও রেওয়াজ নাই। তাই মাঠেও কাজ করা সম্ভব হয় না। কোথায় পাবে টাকা পয়সা? কী করে পূরণ করবে মনের সাধ? অন্যের বাসায় কাজ করে আর কয় টাকাই বা আয় হয়। কোনো

নিজের দোকানে কাজ করছেন লাইলী বেগম

কিছুই হয় না ঠিকমতো। লাইলী বেগম তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, ভিক্ষা করবেন। ভিক্ষা করে হলেও ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাবেন। ভাবনা অনুযায়ী ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করায় লাইলী। তার এই বিপদের সময়ে পাশে এসে দাঁড়ায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মিশনেরই এক মাঠকর্মীর সাথে কথা হয়। মাঠকর্মীর নাম সীমা রানী। লাইলী বেগমের জীবনের দুঃখের কথা শুনে তার মায়া হয়। লাইলী বেগমকে ভর্তি করে নেয়া হয় মিশনের 'চাঁদনী' মহিলা সমিতিতে। সমিতির আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে লাইলী। নানা বিষয় সর্ম্পকে জানতে পারেন। মনে মনে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পান যেন। লাইলী বেগম ভাবেন, 'যদি কিছু পুঁজি পাওয়া যেত তাহলে রাস্তার মোড়ে দোকান দিতে পারতাম। পান, সুপারি, বিস্কুট বিক্রি করে কিছু আয় করা যেত। কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? তিনি তখনও জানতেন না ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ঋণ কার্যক্রমের কথা। মিটিংয়ের আলোচনা শুনে একসময় এই কার্যক্রম সম্পর্কেও সে জানতে পারেন। আরো জানেন যে, গ্রামের অনেকেই এই সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কাজ করছেন।

আলাপ-আলোচনা করে চাঁদনী সমিতি থেকে ৬ হাজার টাকা ঋণ নেন তিনি। মনের ইচ্ছে পূরণের লক্ষ্যে পান, সুপারির দোকান দেন। চানাচুর বিস্কুটও বিক্রি করতে থাকেন। এতে যা আয় হতে লাগল, তা দিয়ে সংসার কোনো রকমে চলতে থাকে। কিন্তু নতুন দোকান, তাই বিক্রি বেশি হতো না। এজন্য স্থান পরিবর্তন করে খাজুরা বাসস্ট্যান্ড মোড়ে দোকান নেন লাইলী বেগম। এবার বিক্রি কিছুটা বাড়ে। সংসারের অভাবও কিছুটা দূর হয়। ভিক্ষা তো দূরে থাক, এখন লাইলী বেগমকে আর অন্যের বাসায় কাজ করতেও হয় না। এখন তার একটাই স্বপ্ন, তার ছেলেকে পড়ালেখা করাবে। পড়ালেখা শিখে ছেলে একদিন অনেক বড় হবে। ভালো একটা কাজ করবে। দোকান চালিয়ে নিজে এক টুকরা জমিও কিনবে। সেখানে নিজেদের জন্য একটা ঘর বানাবে। তাদের যেন আর মামার বাড়িতে থাকতে না হয়। এখন দোকানে আস্তে আস্তে মালপত্র বাড়ছে। বিক্রিও বেশি হচ্ছে। দিন দিন তার কাজের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। ছেলেও স্কুল থেকে এসে তাকে কাজে সাহায্য করে। আয় বাড়ায় প্রতিদিনের খরচ মিটিয়ে ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে জমা হচ্ছে। লাইলী বেগম ঠিক করেছেন, ঋণ পরিশোধ হলে আবারও ঋণ নিবেন। দোকানটিকে আরো বড় করবেন। এখন লাইলী বেগমের সংসারে আগের সেই কষ্ট আর নেই, নেই চোখে মুখে হতাশার চিহ্ন। অভাবকে কীভাবে জয় করতে হয়, তার উজ্জল এক দৃষ্টান্ত এখন লাইলী বেগম।

মো: খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা জোন, ডিএফইডি, ঢাকা

মিশনের প্রেসিডেন্টের যশোর ও খুলনা এলাকা পরিদর্শন

নোটিশ বোর্ড

সোনালী দলের খামার পরিদর্শনে মিশনের প্রেসিডেন্ট

গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলম যশোর ও খুলনা এরিয়া পরিদর্শন করেন। তিনি ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) এর চেয়ারপার্সন। এসময় তার সাথে ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিসি জনাব ড: মো: গোলাম রহমান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক জনাব কাজী এহছানুর রহমান।

পরিদর্শনকালে তিনি যশোরের হাসিমপুর এলাকায় গরু মোটাতাজাকরণ খামার, বিভিন্ন গাছপালা, জমি, বাগানসহ বিভিন্ন বিষয়ের সার্বিক খোঁজ খবর নেন। পাশাপাশি যশোর চাচড়া এলাকায় সোনালী দলের রোমানা পারভীনের উন্নত জাতের ছাগল, দুম্বা, বিশ্বের সবচেয়ে ছোট জাতের গরু, গাড়ল ইত্যাদি খামারও পরিদর্শন করেন। তিনি একতা দলের জেসমীন বেগমের মিনি গার্মেন্টসও পরিদর্শন করেন। তাদের খরচ ও লাভ ক্ষতি কেমন হয়, সে সম্পর্কে খোজখবর নেন। সেইসাথে প্রিয়নাথ দলের প্রকাশ কুমারের চিপস তৈরি এবং বাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা পরিদর্শন করেন।

বিকালে যশোর এরিয়া পরিদর্শন শেষে ডিএফইডি জোনাল অফিসে যান। এ সময় খুলনা এরিয়ার অগ্রগতি তুলে ধরেন জোনাল ম্যানেজার মো: নাসির উদ্দিন। ৫ সেপ্টেম্বর খুলনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয়ের কক্ষে বিশেষ সভা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভিসি, রেজিষ্ট্রার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব ড: মো: গোলাম রহমান। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম, ল্যাব, লাইব্রেরী, কম্পিউটার রুমসহ সব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

দুপুরে তিনি খুলনা গল্লামারী ব্রাঞ্চের কেয়া দলের দুর্গারানীর মুরগি পালন এবং গাভী পালন খামার পরিদর্শন করেন। তাছাড়া মেঘনা দলের নাছিমা বেগমের মুদি দোকানটিও পরির্দশন করেন। বিকালে তিনি সাতক্ষীরা পবিত্র রওজা পাকের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মাগরিবের পরে পবিত্র পাক রওজা শরিফ জেয়ারত করেন এবং মিলাদ ও দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৬ তারিখ যশোরে ডিএফইডির যশোর, ঝিনাইদহ এরিয়ার অর্ধবার্ষিক কর্মীসভায় উপস্থিত হন। সভায় প্রেসিডেন্ট মহোদয় দিক নিদের্শনামূলক বক্তব্য দেন এবং মানুষের কল্যাণে সকলকে কাজ করার আহবান জানান। বিকালে তিনি ভেকুটিয়ার ঠিকানা হোম ও ভিটিআই পরিদর্শন করেন। তাঁর এই পরিদর্শনকালে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ডিএফইডির জোনাল ম্যানেজার মো: নাসির উদ্দিন।

নোটিশ বোর্ড

নরসিংদীর মনোহরদীতে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডিএফইডি-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি কর্তৃক স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার নারান্দি শরাফত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মো: আসসাদিক জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মনোহরদী, নরসিংদী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ডাক্তার খন্দকার আনিছুর রহমান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নরসিংদী।আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ডিএফইডি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ছাদিকুর রহমান শামীম। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোল্লা আজগর আলী, এলাকা ব্যবস্থাপক, ডাম ডিএফইডি, নরসিংদী-২ এলাকা, মো: রবিউল ইসলাম শাখা ব্যবস্থাপক, ডিএফইডি মনোহরদী শাখা এবং মো: মিজানুর রহমান, পিও, প্রবীণ কর্মসূচি। উপস্থাপনায় ছিলেন মো: আসাদুল্লাহ, সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, মনোহরদী। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে মেডিসিন ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ মোট ১৫৭ জন রোগির চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্কুলের শিক্ষক, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল কর্মী, ইউপি মেম্বরগণসহ অনেক লোক সমাগম হয়।

নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এনেছে শীতল পাটি

জেনে নেই

শীতল পাটি তৈরী করছেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী

২০১৬ সালের কথা। সে বছরের জানুয়ারি মাস থেকে মিশন সৌহার্দ্য ৩ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এই প্রকল্প এলাকা হলো দোয়ারা বাজার উপজেলার পান্ডারগাঁও ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো– নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে নারীদের অবস্থা

নারীরা আগে পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তে অংশ নিত না। এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও তাদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত ছিল তাদের জীবন। গ্রামের স্বল্পসংখ্যক নারীরা শখের বশে নিজেদের প্রয়োজনে শীতল পাটি তৈরি করত। একদম সাদামাটা পদ্ধতিতে তৈরি হতো এসব পাটি। স্থানীয় ভাষায় আদি/পাটির প্রধান উপকরণ হলো মুর্তা। প্রাকৃতিকভাবেই সামান্য মুর্তা জন্মাতো এই গ্রামে। কিন্তু আগে এগুলো বিস্তারের কোনো চেষ্টাই নেওয়া হয়নি। নারীদের প্রতিভা বিকাশের উদ্যোগও নেওয়া হয়নি কখনো। এর আগে এই এলাকায় নারী উন্নয়নে কোনো সরকারি, বেসরকারি সংগঠন এগিয়ে আসেনি। এ অবস্থাতে সৌহাদ্য ৩ কর্মসূচি ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়ায়।

নারীদের বর্তমান অবস্থা

সৌহাদ্য ৩ কর্মসূচি অংশগ্রহণকারী নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এগিয়ে আসে। কৃষি ও জীবিকায়ন বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে ৪টি পেশাভিত্তিক দল তৈরি হয়। এর মধ্যে আয়-বৃদ্ধিমূলক ব্যবসা ও গ্রামীণ সঞ্চয় ঋণদান সমিতি উল্লেখযোগ্য।

বিগত তিন বছরে ব্যবসা দলের সদস্যদের দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোট ৪৯ জন অংশগ্রহণকারী শীতল পাটির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পাশাপাশি তাদের জীবন-দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। এখন তারা নিজেদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান খুঁজে নিতে শিখেছে। এদিকে গ্রামীণ সঞ্চয় সমিতির কাজও বেশ ভালো এগুচ্ছে। ইতোমধ্যে পেশাভিত্তিক দলের সদস্যরা নগদ অর্থ সহায়তা নিয়েছে। এজন্য দরিদ্র সদস্যরা ৩০০০ টাকা আর অতিদরিদ্র সদস্যরা ৪৫০০ টাকা করে সহায়তা পাচ্ছেন। উল্লেখিত টাকা প্রশিক্ষিত সদস্যরা পাটি তৈরির কাজে লাগিয়েছেন। তারা ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ করে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তারা এখন বিভিন্ন নকশা সহযোগে পাটি তৈরি করেন। গ্রামের সৌখিন পরিবারগুলোর চাহিদা মিটিয়ে যা এলাকার বাইরেও বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় বাজারসহ পাইকারী ক্রেতার হাত ধরে এসব এখন পৌঁছে যাচ্ছে উপজেলা এবং জেলা শহরে। দলগতভাবে উৎপাদিত পাটি যৌথ ব্যবস্থায় বিক্রয় হচ্ছে। ফলে সময় এবং খরচ আগের চেয়ে কম হচ্ছে।

পাটি তৈরির খরচ ও লাভ

উদ্যোক্তা সালেহা বেগম জানান, ১টি পাটি তৈরি করতে মুর্তা লাগে ২পন। ১পন মুর্তার দাম ১৫০ টাকা ধরলে হয় ৩০০ টাকা। রং লাগে ২ কৌটা। ১২০ টাকা করে কৌটার দাম হলে রঙের দাম হয় ২৪০ টাকা। সুতা লাগে ১০ টাকার। শ্রমের দাম বাদে তাহলে সর্বমোট খরচ হয় ৫৫০ টাকা। ১টি পাটির সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য ১৫০০ টাকা। ৫৫০ টাকা বাদ দিলে শ্রমমূল্য এবং লাভ মিলিয়ে থাকে মোট ৯৫০ টাকা। ১টি পাটি তৈরি করতে পারিবারিক কাজের পাশাপাশি সময় লাগে ১৫ দিন। আর পারিবারিক কাজ ছাড়া সময় লাগে ৭ দিন।

বিষয়টি যেভাবে দেখছেন এলাকার মানুষ

পাটি দলের এই কার্যক্রমে স্থানীয় প্রতিনিধি, সুশীল সমাজসহ সকল স্তরের মানুষ বেশ খুশি। এটিকে নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন তারা। সৌহাদ্য ৩ কর্মসূচির আরো নানান রকম দল আছে। যেমন– ভিডিসি, একতা, সঞ্চয়, আমরাই শক্তি, মা, পুরুষ কৃষক মাঠ ব্যবসা ইত্যাদি। নানামুখী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন কৃষ্ণনগর গ্রামের ভিএসএল-এর সদস্য সালেহা বেগম এবং শিউলি বেগম পুরস্কৃত হয়েছেন। তারা উপজেলা ও জেলা পযায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয়েছেন। আশপাশের গ্রামগুলো তাদের এই কার্যক্রমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছে। শীতল পাটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে ফ্রি দোকান বরাদ্ধ পাবার জন্য তাদের কেউ কেউ আবেদন করেছেন। দোকান বরাদ্ধ পেলে তাদের উৎপাদিত পণ্য পৌঁছে যাবে উপজেলা ও জেলা শহরে। এতে তাদের লাভ আরো বেশি হবে বলে আশা করছেন তারা।

মো: গোলাম মোস্তফা, এফটি, অফফার্ম লাইভলিহুড এন্ড ফাইনান্সসিয়াল ইনক্লুশন, পান্ডার গাও, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

আমি এখন স্বাবলম্বী

আমার নাম বিলকিস। আমার গ্রামের নাম নারিশা খালপাড়। ঢাকা জেলায় দোহার থানায় এই গ্রাম অবস্থিত। নারিশা খালপাড় গ্রামে এক গরিব ঘরে জন্ম আমার। অভাবের কারণে আমি লেখাপড়া করতে পারিনি। সেই অল্প বয়সে, ১৯৯৯ সালে বিয়ে হয় আমার। আমার স্বামীর বাড়িও একই গ্রামে। তার নাম মো: মোকলেছুর রহমান। তারও আয় রোজগার তেমন ভালো ছিল না। সংসারের স্বচ্ছলতা আনার জন্য বিয়ের কিছু দিন পর তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান। দীর্ঘ ১২ বছর সৌদি আরবে থাকেন তিনি। এরই মধ্যে আমার মেয়ে মরিয়ম ও ছেলে মোমিনের জন্ম হয়। বিদেশ থেকে পাঠানো স্বামীর উপার্জিত অর্থ দিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতাম।

কিন্তু কপাল মন্দ। আমার স্বামী বিদেশে ভালো করতে না পারায় ২০১২ সালে দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসেও কোনো লাভ হয় না। কাজ পায় না কোথাও। স্বামীর বেকারত্বে সংসারে আবার দেখা দেয় অভাব অনটন। এই অবস্থায় আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে গাভী পালনের চিন্তা করলাম। কিন্তু আমাদের হাতে যে নগদ অর্থ ছিল তা দিয়ে একটি গাভী কেনা সম্ভব ছিল না। তখন আমি এক আত্মীয়ের মাধ্যমে জানতে পারি নারিশা খাল পাড়ে ডিএফইডি এর সমিতির কথা।

গরুর পাশে দাঁড়িয়ে বিলকিস বেগম

একদিন সেই সমিতির কর্মীর সাথে যোগাযোগ করি এবং সমিতিতে ভর্তি হই। কিছুদিন পর মুকসুদপুর শাখা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিই। এটা ২০১৩ সালের ঘটনা। এরপর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একটি ক্রস জাতের গাভী কিনি। আমি ও আমার স্বামী মিলে গাভীর যত্ন নিই। পাশাপাশি আমার স্বামী ভাড়ায় অটোগাড়ি চালানো শুরু করেন। এতে কোনো রকমে সংসার খরচ ও কিস্তির টাকার ব্যবস্থা হয়। এর কয়েক মাস পর গাভিটি একটা বকনা বাছুরের জন্ম দেয়। এতে ভাগ্য খুলে যায় আমাদের।

পরের বছর কিস্তির টাকা পরিশোধ করে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিই আমরা।

বিলকিস বেগমের গরুর খামার

তা দিয়ে আরও একটি গাভি ক্রয় করি। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে থাকে। ছেলে মেয়ের পড়া-লেখাসহ সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। এভাবে প্রতি বছর আমাদের খামারে গাভির সংখ্যা বাড়তে লাগল। বর্তমানে আবার এক

লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছি আমি। সংসার চালানোর পাশাপাশি নিয়মিত কিস্তি শোধ দিচ্ছি। এখন আমাদের খামারের গাভীর সংখ্যা ৭টি। প্রতিদিন ৩০ কেজি দুধ হয়। নিজেরা খাওয়ার পর বাজারে বিক্রি করি। আমার স্বামী এখন আর অন্যের গাড়ি চালায় না। সারাদিন গরুর যত্ন করতেই তার সময় চলে যায়। দুধ বিক্রি করে যে টাকা আয় হয়, তা দিয়ে খামারের জন্য টিনসেড দিয়ে পাকা ঘর তৈরি করেছি। নিজেদের থাকার জন্য ১০ শতাংশ জমি কিনে পাকা ঘর নির্মাণ করেছি। আমাদের মেয়ে মরিয়ম এখন দ্বাদশ শ্রেণিতে এবং ছেলে মোমিন ক্লাশ এইটে পড়ছে। আমার পরিবারে আর তেমন কোনো অভাব নেই। আমি সত্যিই দুধেভাতে আছি। ভালো আছি।

মো: মোরশেদ আলী, এরিয়া ম্যানেজার, ঢাকা এরিয়া, ডিএফইডি, ঢাকা

আমাদের সংলাপ

মো: জিন্নাহ
পিতা - রুস্তমআলী
সদস্য নং - ০২
দলের নাম - মডেল/০২
ডিএফইডি, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ

প্রশ্ন: আমি গার্মেন্টস থেকে ঝুট কাপড় কিনে এনে ব্যবসা করি। বর্তমানে আমি আমার ব্যবসাটি সম্প্রসারণ করতে চাই। 'ডিএফইডি' আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর: ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগাম রয়েছে। এর শান্তি বিনিযোগ কার্যক্রম থেকে আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন:

১. আর্থিক সহায়তা;
২. কারিগরি সহায়তা;
৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়তা;
৪. ট্রেনিং - এর ব্যবস্থা করা;
৫. বাজারজাত করণে সহায়তা।

১. আর্থিক সহায়তা: আপনি যদি আপনার ব্যবসাটি বড় আকারে করতে চান, তবে 'ডিএফইডি' আপনাকে আর্থিক সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে সহজ শর্তে ইসলামী শরিয়াভিত্তিতে শান্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে অর্থায়ন করা হয়। আপনি চাইলে এই নিয়োগ গ্রহণ করে মূলধন বাড়াতে পারেন ও ব্যাবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন।

২. কারিগরি সহায়তা: এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাড়ে সহায়তা পাবেন। 'ডিএফইডি' উপকরণ কোথায় ও কীভাবে পাওয়া যেতে পারে তার বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে।

৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়তা: একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে সফল ব্যবস্থাপনার ওপর। 'ডিএফইডি' আপনাকে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

৪. ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা: 'ডিএফইডি' আপনার দক্ষতা এবং গুনগতমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এজন্য বিভিন্ন ট্রেনিং এ অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিবে।

৫. বাজারজাতকরণে সহায়তা: ডিএফইডি আপনার পণ্য বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা নেবে। পণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উত্তরদাতা:
মো: মাকছুদুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফইডি, নারায়ণগঞ্জ এরিয়া।

আমাদের দেশে

যশোরের ভাসমান সেতু

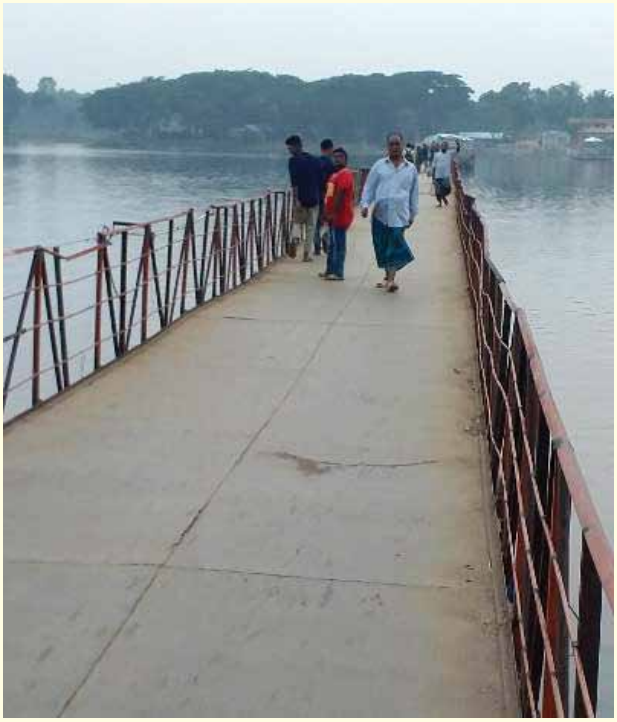

ঝাঁপা গ্রামের ভাসমান সেতু

সিমেন্ট বালি কিংবা লোহা নয়, প্লাস্টিকের ব্যারেল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ভাসমান সেতু। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে এবং নিজেদের টাকায় তৈরি করেছেন এই দৃষ্টিনন্দন সেতু। আর এতে উপকৃত হয়েছেন ঝাঁপাসহ পার্শ্ববর্তী তিনটি ইউনিয়নের কয়েক লক্ষ মানুষ।

সেতু তৈরির আগের অবস্থা

সেতু তৈরির অন্যন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা গ্রামবাসী। যশোরের মনিরামপুর উপজেলার অন্যতম বাণিজ্যিক শহর রাজগঞ্জ বাজার। এই বাজার সংলগ্ন সবচেয়ে বড় বাওড় হলো 'ঝাঁপা'। প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাওড়ের চার পাশ দিয়ে ঘিরে আছে ঝাঁপা গ্রাম। এই গ্রামে বসবাস করে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। কিন্তু দ্বীপ সাদৃশ গ্রাম হওয়ায় এর যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। এপাড় থেকে ওপাড়ে এবং বাইরের সাথে গ্রামবাসীর যোগাযোগে খুব কষ্ট হতো। রাস্তা না থাকায় তাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল নৌকা। ঝড়, বৃষ্টি কিংবা বৈরী আবহাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় যাতায়াতের ওই একমাত্র মাধ্যমটিও। এতে অনেক সময় মূমুর্ষ রোগী কিংবা জরুরী কাজে মানুষকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হতো।

যেভাবে তৈরি হলো এই সেতু

এটা ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর এর কথা। রাত ১০টার দিকে ঝাঁপা গ্রামের একজন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তিনি মরহুম ড: আজিবর সরদারের বড় ছেলে শামছুর জামান (মন্টু)। তাকে সাথে সাথেই হাসপাতালে নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের করা হয়। কিন্তু কোনো যানবাহন না পাওয়ায় পথের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। সে বছরেই ঝড় বৃষ্টির সময় ঝাঁপা বাওড়ে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। এতে কেউ মারা না গেলেও বই খাতাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। চলতি বছরেই একদিন রাতে ঝাঁপা গ্রামের কাঁচামাল বিক্রেতা মতিউর রহমানের মেয়ে রোকেয়া বেগম মারা যায়। সেই আগের মতোই ঘটনা। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ঘটে আরেকটি ঘটনা। রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থেকে আসার

পথে ১২ বছরের শিক্ষার্থী বাওড়ে পড়ে যায়। এরপর জেলেরা তাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ঝাঁপা গ্রামবাসীরা বাওড় এর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এজন্য একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু তাতে কোনো সুফল মেলেনি।

ভাসমান এই সেতু নির্মাণের অন্যতম একজন উদ্যোক্তা মেহেদী হাসান টুটুল। তিনি বলেন, সরকারি দপ্তরগুলোতে আবেদন করার পরেও কোনো সুফল মিলেনি। তখন স্থানীয়ভাবে এর সমাধান করার উদ্যেগ গ্রহণ করি আমরা। এতে গ্রামবাসীরা সাড়াও দেন। শ্রম এবং অর্থ দিয়ে পাশে থাকেন তারা। তাদের সার্বিক সহযোগিতায় অবশেষে নির্মাণ করা হয় এই ভাসমান সেতু।'

এক নজরে ভাসমান সেতু

সেতুর প্রস্থ হলো ৯ফুট, আর ১৩শ ফুট দৈর্ঘ্য। সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত হয় ৮৮৯টি বড় প্লাস্টিকের ব্যারেল। এই ব্যারেলকে সংযুক্ত রাখার জন্য লোহার তার ব্যবহার করা হয়েছে। একই সাথে ব্যারেলের উপর দিয়ে চলাচলের জন্য দেওয়া হছে ১৩শ ফুট দৈর্ঘ্যের লোহার পাত। প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয় ভাসমান এই সেতু। এই খরচের সব টাকাই ঝাঁপা গ্রামবাসীরা বহন করেছেন। টাকা দিয়ে যারা সহযোগিতা করতে পারেননি, তারা স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন। প্রায় ৪ মাস ধরে সেতুটি তৈরি হয়। গত ১

বিলবোর্ডে সেতু সম্পর্কিত তথ্য

জানুয়ারি ২০১৮ চালাচলের জন্য সেতু খুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে সেতুটির উপর দিয়ে ভ্যান,অটোরিকশা, ইজিভ্যান ইত্যাদি ছোট আকারের যানবাহন চলাচল করছে। তবে ঠিক হয়েছে, সেতুতে ভারী যানবাহন কোনোভাবেই চলাচল করতে পারবে না।

ভাসমান এই সেতুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। স্থানীয় মানুষ ভাসমান এই সেতুটি রক্ষার জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

মো: নাসির উদ্দীন, জোনাল ম্যানেজার, খুলনা জোন, ডিএফইডি, খুলনা

মজার খবর

চা ছাড়া কাজ শুরু করে না যে ঘোড়া

এক কাপ চা ছাড়া অনেকেরই সকাল হয় না। আবার কারো কারো সারাদিনও ভালো যায় না। তবে কখনো কি শুনেছেন? চা পান না করে কাজে যেতে চাইছে না কোনো প্রাণী!

কিছু দিন হলো ইংল্যান্ডে খোঁজ মিলেছে এমনই এক ঘোড়ার। চা পান না করে যে দিনের কাজ শুরু করে না। তাই রোজ সকালে এই ঘোড়ার জন্য চা তৈরি করা হয়। পুলিশ কর্মীরা বড় কাপে করে স্পেশাল চা দিয়ে যায় সেই ঘোড়াকে। আর ঘোড়াটিও আয়েশ করে সেই চা পান করে। এরপরই সে কাজে যায়।

ঘোড়াটির নাম 'জেক'। ইংল্যান্ডের লিভারপুলের অ্যালেরটন আস্তাবলের বাসিন্দা এই 'জেক'। এখন তার বয়স কুড়ি বছর। ১৫ বছর ধরে জেক, ইংল্যন্ড পুলিশের ঘোড়সওয়ার বিভাগে রয়েছে। প্রথম প্রথম নাকি 'জেক' তারই সওয়ার পুলিশ কর্মীর কাপ থেকে চা চুরি করে খেত। সেখান থেকেই তার চায়ের নেশা শুরু হয়। আর এখন তার জন্য সকালে চা বরাদ্দ না করলে, তাকে কাজেই নিয়ে যাওয়া যায় না। ইংল্যন্ডের সংবাদপত্র ডেইলি মেল জানিয়েছে এ কথা। রোজ সকালে নাকি ঘুম ভাঙার পর জেক অপেক্ষা করতে থাকে, কখন তার চা আসবে। সকালে পুলিশ কর্মীদের জন্য যে চা দেওয়া হয়, সেখানে তার জন্যও একটি বড় কাপ বরাদ্দ থাকে। শুধু বড় নয়, সেই চা একটু আলাদা করে বানাতে হয়।

মিরসেইসাইড ঘোড় সওয়ার পুলিশ বিভাগের ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক লিন্ডসে গাভেন ডেলি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আস্তাবলের ১২টি ঘোড়ার মধ্যে অন্যতম জেক। আর জেককে যে চা দেওয়া হয় তাতে দুধ ও চিনির পরিমাণ একটু বেশি দিতে হয়। জেকের জন্য চায়ে লাগে দু'টি সুগার কিউব। ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে ঘোড়ার চা খাওয়ার ভিডিও। ভিডিও ইতিমধ্যেই দুই লাখ ২৯ হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে। সেই সঙ্গে অনেকেই মজার মজার মন্তব্য করেছেন।

সূত্র ও ছবিঃ ডেইলি বাংলাদেশ/জেএমএস

মাংসের ভাপা পিঠা তৈরি

শীত এসেছে। এসময় গ্রামে-শহরে সব জায়গায় ভাপা পিঠার দেখা মিলবেই। তা ঘরেই হোক বা বাইরেই হোক। বেশিরভাগ জায়গায় ভাপা পিঠা তৈরি হয় নারকেল ও খেজুর গুড় দিয়ে। কিন্তু চাইলে একটু ভিন্নভাবেও ভাপা পিঠা তৈরি করা যায়। আজ আপনাদের জানাচ্ছি এমনই একটি ভাপা পিঠা তৈরির নিয়ম। এটা মাংস দিয়ে তৈরি এক প্রকার ভাপা পিঠা। ঝাল খাবার যারা পছন্দ করেন, এটি তদের কাছে খুবই লোভনীয়।

পিঠার জন্য উপকরণ

সিদ্ধ চালের গুঁড়া– তিন কাপ, লবণ– এক চিমটি, পানি– পরিমাণ মতো।

ভিতরের পুরের জন্য মুরগির মাংস কুচি– ৩০০ গ্রাম, পিঁয়াজ বাটা– ১চা চামচ, রসুন বাটা– ১ চা চামচ, আদা বাটা– আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়া– আধা চা চামচ, লবণ– স্বাদমতো, জিরা গুঁড়া– আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়া– এক চিমটি, গরমমসল্লা গুঁড়া– আধা চা চামচ, তেল- ৩ টেবিল চামচ, পিঁয়াজ কুচি– আধা কাপ, টমেটো কুচি– মাঝারি ১টা, গাজর কুচি– ১টা, পিঁয়াজ পাতা কুচি– ২ টেবিল চামচ, গোলমরচি গুঁড়া– আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি– ৪/৫টা, ধনেপাতা কুচি– ৩টেবিল চামচ।

তৈরির নিয়ম

প্রথমে একটা পাত্রে তেল গরম করে নিন। এতে পিঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা এবং সব ধরনের গুঁড়া মসলা একসাথে দিয়ে ভালো করে কসিয়ে নিন। তারপর এতে মাংস কুচি দিয়ে ভালো করে কসিয়ে নিতে হবে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত পানি দিয়ে মাংস সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংস সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে এলে গাজর ও পিঁয়াজ পাতা দিয়ে নেড়ে নিন। হালকা সিদ্ধ হলে বাকি উপকরণ ও ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার ভাপা পিঠার চালের গুঁড়ি তৈরি করে নিন। চালের গুঁড়া, কুসুম গরম পানি ও একটু লবণ দিয়ে চালের গুঁড়ি তৈরি করুন। মুঠ করে দেখুন চালের গুঁড়ি দলা বাধে কিনা। যদি দলা বাধে এবং হালকা চাপ দিলেই ভেঙে যায় তাহলে বুঝতে হবে চালের গুঁড়িপিঠার জন্য তৈরি। এবার গুড়ের জায়গায় মাংসের পুর দিয়ে ভাপে বসিয়ে পিঠা তৈরি করে নিন। শীতের সকালে এই পিঠা খেতে বেশ মজা।

সুলতানা পারভিন, গৃহিণী, বেনাপোল, শার্শা

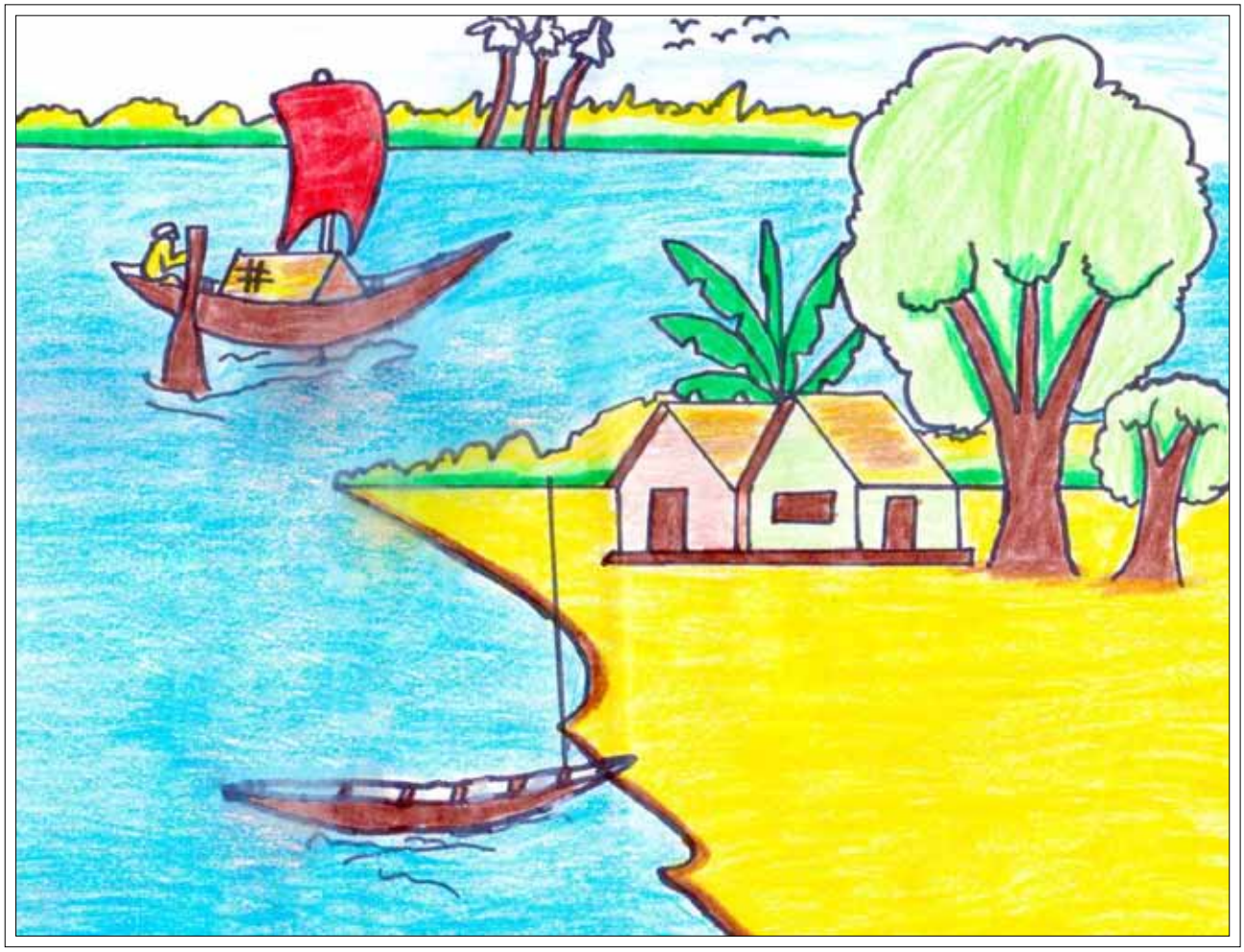

ছবিটি এঁকেছে: **মোছা: মনি আক্তার**, রামচন্দ্রদী সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র - ২০, দ্বিতীয় শ্রেণি
মাতার নাম - মোছা: আকলিমা বেগম, *দলের নাম* - কেয়া/৮৮

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission